Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের সাথে আচরন কেমন হওয়া উচিত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা শারাফত করীফ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা আফরিন আশা

রোলঃ 216020374

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

অমুসলিমদের সাথে আচরন কেমন হওয়া উচিত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা আফরিন আশা

রোলঃ 216020374

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অমুসলিমদের সাথে আচরন কেমন হওয়া উচিত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা আফরিন আশা আইডিঃ 216020374 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের সাথে আচরন কেমন হওয়া উচিত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা শারাফত করীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সানজিদা আফরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সানজিদা আফরিন আশা

আইডিঃ 216020374

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

শুরুতেই বর্তমান সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে অমুসলিমদের সাথে আচরনের ক্ষেত্রে কিছু কথা খুব চোখে পড়ে যেমন,ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না,অন্যের ধর্মকে অবজ্ঞা করো না, ধর্ম যারই হোক উৎসব সবার,ধর্ম বড় নয় মানুষই বড়,মানবতাই হোক আমাদের ধর্ম ইত্যাদি।দেশের এক শ্রেনীকে দেখা যায়, মুসলিম অথচ অমুসলিমদের উৎসবে মেতে উঠতে।শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে অনেকেই নিজের ঈমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেও দুইবার ভাবছে না।হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট্রান কাউকেই আলাদা করা যাচ্ছে না।এই কি ছিলো আমাদের ইসলামের শিক্ষা!! আমাদের প্রিয় নবীজী (সলাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তবে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন ধরায়!

আফসোস।

বিষয়গুলো আমাদের বর্তমান প্রজন্ম কে কি শিক্ষা দিচ্ছে তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে এক অসুস্থ প্রজন্ম যারা জানবে না তাদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস,প্রান প্রিয় নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুসলিমদের সাথে কেমন আচরন করেছেন , কেমন ছিলেন আমাদের সাহাবী রা ।এরা শুধু জানবে ধর্ম নিয়ে অতো বাড়াবাড়ির কিছু নেই।

আল কোরআনে আল্লহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে অমুসলিমদের সাথে আচরনের বিষয়ে কি নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নের দুইটি আয়াতে তা লক্ষ্য করুন,

★হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম।(সুরা আত তাওবাহ -২৩)

★দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (সুরা মুমতাহিনা৮)

দুইটি আয়াতই অমুসলিমদের সাথে আচরন সম্পর্কিত।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।আমাদেরকে এই বিষয়টা বুঝতে হবে।

ভূমিকা

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে।

সেগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

★ইসলাম শান্তির ধর্ম। জীবনের সকল সমাধান আছে এখানে।এ ধর্মে আছে প্রেমময়তা, দয়া ও অনুগ্রহ। ইসলাম নিজ ধর্মের মানুষদের যেমন সম্মানের চোখে দেখে, ঠিক অন্য ধর্মের মানুষকেও মানুষ হিসেবে সম্মানের যোগ্য মনে করে। ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়। শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি, তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি, সৌজন্যবোধ ও মেলামেশা করতেও নিষেধ করেনি।পাশাপাশি দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়ারও সুযোগ নেই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,''আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে;(সুরা যুমার:২৭)

উপরের আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, সব দৃষ্টান্ত! সুবহানাল্লহ । তাহলে কি অমুসলিমদের প্রতি আচরনের বেলায়ও কোরআন ই আমার একমাত্র সমাধান হবে না?অবশ্যই। অনুরুপ ভাবে নবিজী সলাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পূর্ন জীবনিই আমাদের জন্য শিক্ষা, আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

অমুসলিমদের সাথে আচরনে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষ্য করি,

“ হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব’ (আবু দাউদ)।”

কঠিন সেই দিনে যদি নবীজি আমাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন তবে কি হবে আমাদের পরিনতি!!হে মুসলিম উম্মাহ সময় তবে এখনই অমুসলিমদের সাথে আচরনের পথ পন্থা জেনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা মেনে চলার।

মোটকথা অমুসলিমদের সাথে আচরনের শিক্ষা আমরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে শিখবো,সে অনুযায়ী জীবন পরিচলনা করার মধ্যেই রয়েছে কল্যান।আল্লাহর তৌফিক কামনা করছি। আমিন।

উদ্দেশ্য

দাওয়াতের সবচেয়ে বড় হকদার হলো অমুসলিমগণ। সীরাতে রাসুল এবং সাহাবায়ে আজমাইনদের জীবনচরিত থেকে আমরা এ শিক্ষায় পেয়ে থাকি। তাই এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য হলো – অমুসলিমদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের আচার ব্যবহার এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করা।নবীজীর(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহন করা।

শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা

সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী (র.) কতৃক রচিত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার বিষয়ক বইয়ে তিনি অমুসলিম নাগরিকের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন....

ইসলামী আইন অমুসলিম নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে:

★এক. যারা সন্ধি বা চুক্তি বলে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছে। ★দুই. যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

★তিন. যারা যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

থিসিসের সুবিধার স্বার্থে এখানে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের অধিকার তুলে ধরা হলো:

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক

যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। কোনো জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায় (চাই তা মনোপুত হোক বা না হোক) এখন তাতে চুল পরিমাণও হেরফের করা যাবে না। চাই উভয় পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় যতোই পরিবর্তন এসে থাক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"যদি তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে রাজী হয় (অপর বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের সাথে কোনো সন্ধিপত্র সম্পাদন করে) তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত মুক্তিপণের চেয়ে কণা পরিমাণও বেশী নিও না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।" [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]

অপর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর যুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে

তাকে কম দেবে, তার সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে অথবা তার কাছ থেকে কোনো জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।" [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]

অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোনো রকম কমবেশী করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। তাদের ওপর কর খাজনাও বাড়ানো যাবে না। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবে না, তাদের ঘরবাড়ী দালান কোঠাও কেড়ে নেয়া যাবে না। তাদের ওপর কড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধিও চালু করা যাবে না, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাদের ইজ্জত সম্মানেরও ক্ষতি করা যাবে না এবং তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা যুলুম, অধিকার হরণ, সামর্থের মাত্রারিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পত্তি হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে।

এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন:

"তাদের সন্ধিপত্রে যা নেয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পূরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবে না। [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৩৫।

ড. রাগিব সারজানি অমুসলিমদের সাথে নবীজির আচরন বিষয়ক বইয়ের ভূমিকাতে বলেছেন,

মানবজাতির জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণতার সুউচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ এবং সৃজনশীলতা ও অভিনবত্তের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত। এ শাশ্বত ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রিকতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ঐ ঘোষণাই যথেষ্ট যা তিনি কুরআন অবতরণের সমাপ্তি লগ্নে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন,

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). [المائدة: ٣]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

অর্থাৎ দীন পূর্ণাঙ্গ, নি'আমতও পরিপূর্ণ। এতে কোনোরূপ অপূর্ণতার অবকাশ নেই। মানব জীবনের সকল বিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রের যাবতীয় নীতিমালা ও বিধি-বিধান এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ما فرطنا في الكتب من شيء ثم إلى ربهم يُحْشَرُونَ) [الانعام: ٣٨] "

আমি কিতাবে কোনো ত্রুটি করি নি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قد تركتكم على البيضاء . ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك "

আমি তোমাদের সুস্পষ্ট-দীনের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত, তার দিনের মতোই। আমার পরে যে ব্যাক্তি এর থেকে বিমুখ হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হলো ইসলামী শরী'আতের প্রতিটি বিধি-বিধানের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনক্ষেত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, শান্তি-অশান্তি, সফর-হযর, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা- দরিদ্রতা ও ভীতি-নিরাপত্তার সকল অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবগোষ্ঠির প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য যতগুলো ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হতে হবে সকল কিছুর শর'ঈ সমাধানের বাস্তব ও সুস্পষ্ট নমুনা নবী চরিত্রের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবনে ঐ শ্রেণির মানুষের সাথে আচার-আচরণ এবং লেন-দেনের মডেলও উপস্থাপন করেছেন যে শ্রেণির মানুষের সাথে

কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিমদের কারো না কারো আচার- আচরণ এবং লেনদেন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

নববী চরিত্রে মানবজাতির জীবন বিধানের যে রূপরেখা পেশ করা হয়েছে তা মূলতঃ মহান আল্লাহ তা'আলারই প্রণিত, প্রদত্ত ও প্রেরিত জীবনবিধান, যা তিনি নবী জীবনের ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনানুসারে উপস্থাপন করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وذكر الله كثيرا (٢١) [الاحزاب: ٢١]

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

1. ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭১৮২; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৩৩১।

বইটিতে তিনি আরও বলেন:

সর্বপ্রথম আমাদের এটা জানা উচিৎ যে, একজন মানুষ হিসেবে তার প্রতি সাধারণ বিবেচনায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কী? তাহলে আমরা জানতে পারব অমুসলিমদের বিষয়গুলোকে ইসলাম কীভাবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে ইসলামের আচরণবিধি কী?

নিশ্চয় একজন মানুষ সাধারণ মানবিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত এবং সাধরণভাবে এ সম্মানের বিষয়টি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে এতে কোনো তারতম্য নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে ঘোষণা করেন:

ولقد كرَمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْتهم في البر والبحر ورزقنَهُم مِّنَ الطيبت وفضلتهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (٧٠) [الاسراء : ٧٠]

"আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

আদম সন্তানের এ সম্মানের বিষয়টি ব্যাপক তথা সকল মানুষই এতে অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহ নিজেই আপন অনুগ্রহের ছায়া মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই বিস্তৃত করেন। কাজেই সকল মানুষকেই তিনি জলে-স্থলে বাহন ও রিযিক দান করেন, সকল মানুষকেই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সব কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গিটি সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামী শরী 'আতে সকল ক্ষেত্রেই মানবকুলের প্রতি এ সম্মান রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা এবং কাজেই এ দৃষ্টিভঙ্গিটির প্রতিফলন ঘটেছে। এটা আমাদের জন্য এক মহান ও অনন্য পন্থা ও পদ্ধতির সন্ধান দেয়, যে পন্থা ও পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিরুদ্ধাচারণকারী ও অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ করেছেন।সকলের সাথেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল সম্মানসূচক। কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ করা বা কারো প্রতি যুলুম করা কিংবা স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তার মর্যাদাহানী করা বৈধ নয়। এ বিষয়টি কুরআনে কারীমের অনেক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত থেকে স্পষ্টত ফুটে উঠে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ولا تقتلوا النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق) [الانعام: ١٥١] "

আর বৈধ কারণ ছাড়া সে প্রাণকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫১]

পবিত্র কুরআনের এ আদেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। কাজেই মুসলিম এবং অমুসলিম সকল মানব প্রাণই এখানে উদ্দেশ্য। অতএব ইসলামের আদল তথা ইনসাফ ও ন্যায়ের

বাস্তবায়নও সাধারণভাবে সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ধর্ম ও বর্ণ বিবেচনায় এখানে তারতম্য করা যাবে না।

ইমাম কুরতবী রহ. বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়া প্রাণকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটি মু'মিনের প্রাণ হোক বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের। তবে যদি কারো দ্বারা এমন কোনো কাজ সংগঠিত হয়, যার দরুন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব সেটা ভিন্ন ব্যাপার। অতঃপর তিনি একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন,

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قتل معاهدا في غير كنهه، حَرّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধকে অন্যায়ভাবে কোনো কারণ ছাড়া হত্যা করেছে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। "14

ইসলামী শরী'আতে সকল শ্রেণির মানুষের প্রতি সর্বপ্রকার যুলুম নিষিদ্ধ। আর এ নিষিদ্ধকরণ অগণিত আয়াতে কারীমাহ ও হাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত এবং এ বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বান্দার হিসাব-নিকাশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মীযানসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭]

এখানেও ন্যায়বিচারের এ বিধানটি সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনো শর্তযুক্ত হয় নি। কাজেই সেদিন কোনো মানবাত্মার প্রতিই যুলুম করা হবে না। চাই সেই মানবাত্মা

আল্লাহতে বিশ্বাসী হোক বা কাফির হোক, মুসলিম বা নাসরানী, ইয়াহূদী কিংবা আরো যত একঘেয়ে বা ভিন্ন চিন্তাধারী হোক না কেন কারো প্রতিই যুলুম করা হবে না। নিশ্চই যুলুম খুবই জঘন্য কাজ, আল্লাহ তা'আলা নিজ ও নিজ বান্দাদের জন্য যুলুম চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَما ولا . تظ الموا».

"হে আমার বান্দারা আমার নিজের জন্য যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা চিরতরে হারাম করেছি, কাজেই তোমরা পরস্পর একে অন্যের উপর যুলুম করো না" 15

এটাই হচ্ছে মানুষের ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। এটা আত্ম-উপলব্ধি, সম্মান এবং মর্যাদাকর দৃষ্টিভঙ্গি এবং কতই না হৃদয়গ্রাহী ও মহৎত্তর পন্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যখন তার পাশ দিয়ে একজন ইয়াহূদীর শবদেহ অতিক্রম করছিল। ইমাম মুসলিম রহ. ইবন আবী লাইলার সূত্রে বর্ণনা করেন,

أن قيس بن سَعْدِ وَ سَهْلَ بْنَ حنيف كانا بالقادسية. قمرت بهما جنازة. فقاما. فقيل لهما : إنها من أهل الأرض. فقالا: إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل: إنه يهودي. فقال "أليست نفسا».

"কায়স ইবন সা'দ ও সাহল ইবন হুনায়িফ দু'জনই কাদেসিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হলো যে, এ জানাযাটি একজন কাদেসিয়াবাসীর। তাঁরা দু'জনই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তিনি

দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল জানাযাটি ইয়াহূদীর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত এ পন্থা বা অবস্থানটি কি শ্রেষ্ঠতম নয়?

এটাই হচ্ছে শুধুমাত্র একজন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

★বর্ষ:১১ সংখ্যা ১ এ মাসিক আল কাওসারে অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা নামক এক প্রতিবেদনে মাওলানা শিববীর আহমেদ উল্লেখ করেছেন,

সাহাবী হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস : **১৩১১**

আরেক হাদীসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তাঁরা তখন শোনালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' -সহীহ বুখারী, হাদীস : **১৩১২**

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।[1]

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা

চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামে অমুসলিমদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধের বিধানও দেয়া হয়েছে- এ কথা ঠিক, তবে এও অনস্বীকার্য যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণের কথাও বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও যেন অমানবিক আচরণ করা না হয়, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে, বিশেষত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যেন হামলা করা না হয়- এ আদেশও দেয়া হয়েছে।

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হল- তার সাথেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দুটি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে।

সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعَتَ جَنَازَتَهُ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ ...

'যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে

তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোনো ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও। যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে। [খারায়েতী, তবারানী, আবুশ শায়খ- ফাতহুল বারী[2], খ. ১০, পৃ. ৫১৯, কিতাবুল আদব, বাব-৩১]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে নির্দেশনা তো আরও স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬১৩৮

প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার এই যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনটি বলা হয়নি- তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় যদি মুসলমান হয়, ধার্মিক হয়, ভালো মানুষ হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয় যেমনই হোক, মুসলমান হোক কিংবা না হোক, তার অধিকার অকাট্য ও অনস্বীকার্য। একজন মুসলমানকে এ অধিকার রক্ষা করেই জীবনযাপন করতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা এমনও রয়েছে, যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আনকাবুতের ভাষ্য-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

আমি মানুষকে বাবা-মায়ের সাথে সুন্দর আচরণের আদেশ করেছি। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না। -সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৮

সূরা লুকমানে একই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচরণ কর। এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন কর, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে। -লুকমান, আয়াত : ১৫

কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যদি কোনো মুশরিক বাবা-মা তাদের মুসলিম কোনো সমন্তানকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করতে বলে, তাহলে তাদের এ আদেশ কখনো মানা যাবে না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। বাবা-মায়ের হক আদায় করতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্বলিত যেসকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেসবে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি- সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবেন।' -জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৯৪৩

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে বসবাস করবে, তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা

তাদের নির্ধারিত সকল হক পাবে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্যে এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ

আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- ‘কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।’ এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সূরা মুমতাহিনার এই নির্দেশনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য –

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালিম। -সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯

শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে যেমন অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি এ আচরণটুকুও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন এবং পরবর্তীতেও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যারাই ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণই নীরবে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের শীতল ছায়ায়।

১৫ অক্টোবর ২০২১ যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়,

মানবতার নবী ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার উম্মতকে সদা এই নির্দেশই দিয়েছেন তারা যেন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।

মহানবীর (সা.) অতুলনীয় জীবনাদর্শ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল।

হজরত আবুবকর (রা.)এর কন্যা আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মহানবীর (সা.) যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলাম- আমি কি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব?

তিনি (সা.) বললেন, হ্যা’ (সহিহ বোখারি)। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবী (সা.) বললেন, তার পেশাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালাতি পানি আনলেন এবং পানি পেশাবের ওপর ঢেলে দেয়া হল’ (সহিহ বোখারি, কিতাবুল আদব)।

মহানবীর (সা.) আদর্শ এতটাই অতুলনীয় ছিল যে তিনি ইহুদীর লাশকেও সম্মান দেখিয়েছেন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, একবার এক ইহুদীর লাশ বিশ্বনবীর (সা.) সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে মহানবী (সা.) সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না লাশটি তার সামনে থেকে চলে যায়।

পাশ থেকে হজরত জাবের (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটি তো ইহুদীর লাশ। এতে আল্লাহর রাসুল উত্তর দিয়েছিলন, সে কি মানুষ ছিল না? (সহিহ বোখারি, হাদিস নং ১৩১১)।

যে নবী এক ইহুদীর লাশকে সম্মান জানানোর জন্য তার সাথিদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই নবীর উম্মতের পক্ষে কিভাবে সম্ভব শুধু ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে কারো ওপর অন্যায় অত্যাচার করা।

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব’ (আবু দাউদ)।

হজরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন’

(মুসনাদে আহমদ)। এছাড়া মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফির হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদোয়া দ্রুত কবুল হয়ে যায়)' (মুসনাদে আহমদ)।

এছাড়া আমরা লক্ষ্য করি মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতিও মহানবী (সা.) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা মহানবীর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের এক মেয়েও ছিল। যখন সে মহানবীর (সা.) কাছে বললো, সে হাতেম-তাঈর মেয়ে, এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তার সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন' (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২৭)।

আমরা যদি সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করি যখন মক্কার লোকেরা মহানবীর (সা.) কোন কথাই যখন শুনতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি (সা.) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি (সা.) তায়েফ পৌছলেন, তখন সেখানকার নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করার জন্য আসতে লাগলো। কিন্তু কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজী হলো না। সাধারণ লোকেরাও তাদের নেতাদেরই অনুসরণ করল এবং খোদার বাণীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগলো।

এখানে ঘটনা সংক্ষেপ করছি, কেননা-আপনাদের সকলেরই এ ঘটনা জানা আছে। পরিশেষে তারা সব ভবঘুরে ছেলে ছোকরাদেরকে একত্রিত করলো। তারা প্রত্যেকেই ঝোলা ভর্তি পাথরের টুকরা নিল। তারা নির্মমভাবে মহানবীর (সা.) ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে।

অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে মহানবীকে (সা.) শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ রাসুলের দু'টি পা রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। তারপরও তারা ঠান্ডা হলো না, যতক্ষণ না তিনি (সা.) শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড়ে এসে পৌছলেন। এই লোকগুলো যখন তার পিছু পিছু ধাওয়া করছিল, তখন তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহর গজব না আবার তাদের ওপর পড়ে।

তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও! কেননা এরা জানে না, এরা কি করছে।’ একটু ভেবে দেখুন, আঘাতে জর্জরিত ও লোকদের তাড়া খেয়ে তার শরীরে চলার মত আর শক্তি ছিল না। এত কিছুর পরও তিনি (সা.) তাদের অভিশাপ দেননি বরং তাদের জন্য দোয়াই করেছেন।

এমনই ছিলো মানবদরদী রাসুল, শ্রেষ্ঠ রাসুল মহানবীর (সা.) আদর্শ। আমরা যদি মহানবীর (সা.) জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি কতইনা উত্তম আচরণ করেছেন অন্যান্যা ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর একই শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তাই এরূপ আজিমুশ্বান নবীর (সা.) ওপর লক্ষ লক্ষ দরূদ ও সালাম। ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যেকা দায়েমান ফি হাযিহিদ্দুনিয়া ওয়া বাসিন সানী। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে বিশ্বনবীর (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

বল প্রয়োগ করে ইসলাম নয়

ইসলামের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

কোনো ধরনের চাপ বা বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। আল্লাহ বলেন, ‘দ্বিন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

ধর্মীয় অধিকার

প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজেও অমুসলিমরা নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের

অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের দ্বিন তোমাদের, আমার দ্বিন আমার।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবার অংশগ্রহণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনেক পণ্ডিত স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যত দিন তারা এ চুক্তি রক্ষা করেছে তত দিন তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ বহাল ছিল।

আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন

আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। একবার একজন ঋণদাতা ইহুদি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কোনো প্রতিবাদ না করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সাহাবাদের নির্দেশ দেন।

মানবীয় আচরণ

সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে,

একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সাদ (রা.) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, 'তা কি প্রাণ নয়?' (বুখারি, হাদিস : ১২৫০)

পারস্পরিক সহযোগিতা

পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করা

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। নবী (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (বুখারি, হাদিস : ১২৯০)

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা

সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬৬৮; মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৪)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।' (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)

জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত ও বাস্তবায়িত হলে ইসলামের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে।

অমুসলিমদের সঙ্গে মহানবীর আচরণ, ধর্ম ডেস্ক, অক্টোবর ২১, ২০২১, ০১:৫৫ পিএম জার্নালে বলা আছে -

ইসলাম শুধু অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি, তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি, সৌজন্যবোধ ও মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে। কারণ, ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, যার বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার সব উপাদান, মাধুর্য ও ঔদার্য আছে। অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের সৌন্দর্য ও উদারতা নিয়ে বিশাল কলেবরে বইপত্র ও কিতাবও রয়েছে।
এখানে মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সা.) অমুসলিমদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন তা আলোচিত হয়েছে।

অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা

অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি প্রয়োজনে তারা মসজিদে বসারও অনুমতি আছে। যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসুল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে গম্বুজের কাছে অবস্থান করে।
যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, নামাজের সময় হয়েছে। এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রাসুল (সা.) বলেন, ‘অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস : ৮৫৭৬)

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নত। নবী করিম (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.)

বলেন, এক ইহুদি দাস নবী করিম (সা.)-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।' (বুখারি, হাদিস : **১২৫৬**)

অমুসলিম মৃতদের সম্মান করা

তাদের জীবিতের যেমন হক রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের দাফন বা সৎকারে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা তারা শ্রেষ্ঠ মাখলুক তথা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সাদ কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তখন তারা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদের বলা হলো, ইনি তো কাফির। তখন তারা বলেন- মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় এক জানাজা নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাজা। তখন তিনি বলেন, এটা কি প্রাণী নয় (মানব নয়)?' (সহিহ বুখারি, হাদিস : **১২১৩**)

অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে জিম্মি হিসেবে (মুসলিম রাষ্ট্রের আইন মেনে) বসবাস করে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তেমনি যারা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলমানদের মতোই অপরিহার্য। হাদিস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে

জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি, হাদিস : ৩১৬৬)

অমুসলিমদের দান-সদকা করার বিধান

সদকা শব্দটি সাধারণত নফল দান-অনুদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে যেকোনো অমুসলিমকে দান করা সব আলেমের ঐকমত্যে বৈধ। অমুসলিম প্রতিবেশী আক্রান্ত হলে, তারা বিপদগ্রস্ত হলে মুসলমানদের উচিত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি জাকাত অমুসলিমদের দেওয়া যাবে না। শুধু জাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা হয়েছে, অন্যথায় যেকোনো দান-সদকা, এমনকি ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয় যে জাকাত দিতে হয় বছরে একবার। মুসলিম ধনীদের মধ্যে কারো প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা কিংবা এর অর্থমূল্য পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকলে এবং এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে ২.৫ শতাংশ আদায় করতে হয়। অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়। তা ছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও মোটামুটি সচ্ছল যে কেউ আদায় করতে পারে।

অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো—তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান (দলিল ও প্রমাণ) নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করব, যা তোমরা করতে।' (সুরা লোকমান : ১৫)

আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। তখন আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা এসেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মবিমুখ (অমুসলিম)। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৬২০)

ইসলামের প্রধান লক্ষ্য মানবতার কল্যাণ। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য পারস্পরিক লেনদেন ও দান-অনুদান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। মানবতার বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত এক জার্নালে মুফতি কাজী সিকান্দার বলেন,

আমরা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাসের দিক থেকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত আল্লাহ এবং শেষ নবীকে মানে অর্থাৎ মুসলিম। দ্বিতীয়ত যারা আল্লাহকে মানে এবং শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) কে না মেনে পূর্বের কোনো নবীকে মানে যেমন, ইহুদি, খ্রিষ্টান ইত্যাদি। তৃতীয়ত যারা আল্লাহ ও নবী কাউকে না মেনে অন্য কোনো বস্তু বা দেবতার পুজা করে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি। চতুর্থত যারা কোনো ধর্ম মানে না। যেমন নাস্তিক। এ মৌলিক চার প্রকারের প্রত্যেক প্রকারে অনেক দল ও গোষ্ঠী রয়েছে। এখন যারা ইসলাম ধর্ম পালন করে তাদের সাথে অন্যান্য ধর্ম, মত ও পথের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তার

মৌলিক বিধানে আল্লাহতায়ালা বলছেন, 'তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভালো ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুত্ব করবে না তাদের সাথে, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিস্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিস্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে তারাই জালিম।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত-৮, ৯)

এখানে আল্লাহতাঅয়ালা দুটি কারণের পরিপেক্ষিতে দুটি বিধান দিয়েছেন। একটি হলো সুবিচার করা। দ্বিতীয়টি হলো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা। মুসলিম ব্যতীত অন্য সব জাতির সাথে সুবিচার করার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, বরং সুবিচার করার প্রতি মুসলিমকে উৎসাহিত করেছেন এ বলে যে, 'আল্লাহ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন'। এখানে এ সুবিচার ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত দিয়েছেন। তা হলো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কৃত করেনি তাদের সাথে সুবিচার করতে। অপরদিকে যারা যুদ্ধ করেছে বা করছে এবং যারা তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কৃত করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে নিষেধ করেননি শুধু জুলুমও বলেছেন। তাহলে যে অমুসলিম মুসলিমদের সাথে কোনো যুদ্ধে বা তাদেরকে অত্যাচার ও নিপীড়নের সাথে জড়িত নয় এবং যারা অত্যাচার করে যুদ্ধ করে তাদেরকে সাহায্য করে না এমন অমুসলিমদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হলো সুবিচার, ন্যায়বিচারের। আর যারা যুদ্ধ ও যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তাদেরকে সাহায্য করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্বহীন সম্পর্ক। এ হুকুম সব অমুসলিমের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পূর্বের মৌলিক সম্পর্ক বজায় রেখেও ইসলাম মুসলমানকে আহলে কিতাবদের সাথে বিশেষ সম্পর্কের হুকুম দিচ্ছেন। আহলে কিতব হলো যে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহতায়ালা কিতাব নাজিল করেছেন এবং নবী এসেছেন উক্ত নবীকে তারা মেনেছেন এবং কিতাব মেনেছেন।

আহলে কিতাবীদের সাথে সম্পর্কের সূত্র অনেক হতে পারে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, লেনদেন থাকার সম্পর্ক ইত্যাদি। আহলে কিতাবের সাথে মুসলিমদের সামাজিক সম্পর্ক মজবুত ও দৃঢ় করার লক্ষ্যে ইসলাম কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। যা ইসলামের উদারনীতি ও সাম্যতার উৎকর্ষতা নিরূপণ হয়। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবীদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করা থেকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আহলে কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে উত্তমপন্থায়, তাদের ছাড়া যারা ওদের মধ্যে জালিম। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, সে জিনিসের উপরও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ এক ও অভিন্ন। আর আমরা তারই অনুগত আত্মসমর্পিত।' (সুরা আনকাবুত) এখানে আল্লাহতায়ালা যেমন হুকুম দিচ্ছেন তর্ক না করতে। তেমনিভাবে সুন্দরভাবে তর্ক করার নির্দেশও দিচ্ছেন। অর্থাৎ এমন তর্ক যেন না হয় যাতে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ছাড়ায় এবং পূর্বেকার কিতাব ও নবীকে হেয় করা হয়। এমন বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থেকে সুন্দরভাবে তাদের ধর্ম এখন অচল ও তাদের ধর্ম এখন পরিবর্তিত হয়েছে যুক্তির নিরেখে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আহলে কিতাবীদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করার ক্ষেত্রে আরেকটি নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহতায়ালা বলেন, আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবারও হালাল তাদের জন্য। আর সুরক্ষিত পবিত্র নারী মুসলমানদের ও তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের তাও হালাল। (সুরা মায়েদা) আহলে কিতাবের সাথে পানাহার ও তাদের জবেহকৃত পশু হালাল করে তাদের খাবার হালাল ঠিক তেমনি তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল বলে এ দুজাতির মধ্যে দূরত্বের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে একেবারে নিকটে নিয়ে এসেছেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ও আহলে কিতাব যেন দূরত্বে না থেকে একেবারে নিকটে এসে একাত্ববাদের জয়গান গেয়ে ওঠে। তবে এসবের ক্ষেত্রে যারা জালিম তাদের থেকে দূরে অবস্থান করার নির্দেশ। যারা ইসলাম ও মুসলিম ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের থেকে অবশ্যই দূরত্ব বজায় রেখেই চলতে হবে। জালিমের সাথে তো বিতর্ক নয় শুধু যুদ্ধও

হবে। এধরনের লোককে সর্বযুগে চিহ্নিত করে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে ইসলাম ও মুসলিমকে হেফাজতের ফিকির করতে হবে।

আহলে কিতাব বলতে বর্তমানে দুজাতিকে বুঝানো হয়। এক. ইহুদি দ্বিতীয়. খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। যখন ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয় তখনিই ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মবিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। তবুও ইসলাম তাদের সাথে বিবাহসহ অন্যান্য সম্পর্ক গড়ে তোলার বিধান করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে রাসুল (সা.) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং তাদের বাড়ি গিয়ে খানা খেতেন এবং মদিনায় যাওয়ার পর মদিনা সনদ নামে অন্যান্য গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল অগ্রগণ্য। আহলে কিতাবদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক আরো নিবিড় ও গভীর। তা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবতায় যেমন দেখা গেছে। অপর দিকে আল্লাহও তা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘তোমরা ঈমানদারদের বন্ধুত্বে নিকটবর্তী পাবে সেই লোকদের, যারা বলেছেন, আমরা নাসারা (খ্রিষ্টান)। তা এজন্য যে তাদের বহু পণ্ডিত বিদ্বজ্জন রয়েছে, আর তারা অহংকার করে না।’ (সুরা মায়িদা)

এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন মুসলিমরা প্রথম হিজরত করেছে আবিসিনিয়ার দিকে তখন খ্রিষ্টান রাজা নাজ্জাসী সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে অনেক সহযোগিতা করেছেন। মদিনাতেও তারা সহযোগিতা করেছেন। পরবর্তীতে তাদের কিছু লোক ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের শিকার বা প্ররোচনায় ইসলাম ও মুসলিমের বিপক্ষে কাজ করে। যখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগলো তখনি তাদের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। বর্তমানেও তারা ইহুদিদের ভুল প্ররোচনায় কাজ করছে।

উপরোল্লেখিত সব সম্পর্ক সব স্থানের সাথে সম্পর্ক। আর ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী আহলে কিতাবদের সাথে ইসলামের আরেকটি চুক্তি রয়েছে। তাদের সাথে ইসলামের একটি ওয়াদা রয়েছে যাকে ইসলামী পরিভাষায় জিম্মি বলা হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাজা ও অমুসলিম প্রজার সুসম্পর্ক তৈরি হবে। যেসব অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা। নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের করতে পারার নিশ্চয়তা প্রদান

করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ চুক্তি পালন করা এ ওয়াদা পরিপূর্ণ করার নাম জিম্মি বিধান। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য যে অধিকার ঠিক তদ্রূপ অমুসলিমদের জন্যও। দায়-দায়িত্ব উভয়ের সমান। তবে শুধু বিশ্বাস ও ধর্মের ব্যাপারে ভিন্নতা রয়েছে। এখানে ইসলামের উদারতা আরো প্রতিস্থাপিত হয় যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেও তাদের ধর্ম পালন করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাদের সব নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। রাসুল (সা.) জিম্মিদের ব্যাপারে উম্মতকে অনেক সতর্ক করেছেন। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে লোক কোনো জিম্মিকে কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল’। যে লোক কোনো জিম্মিকে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলা লড়ব।’ (আবু দাউদ)

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমগণ জাকাত দেন এটি ফরজ বিধান। ফিতরা দেন, ওশর দেন এবং সদকা দিয়ে থাকেন। এখানে কিছু ফরজ কিছু ওয়াজিব কিছু সুন্নাত। আমাদের সবার জানা রয়েছে যে, অমুসলিমদের উপর জাকাত ফরজ নয়। ঠিক তেমনিভাবে তাদের উপর ফিতরা, ওশর বা সদকাও বাধ্য-বাধকতা নেই। আর অমুসলিমগণও ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ। তবে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক জনগণকে আর্থিক সহযোগিতা করতে হয়। তা করের মাধ্যমে, ট্যাক্সের মাধ্যমে ইত্যাদি। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমগণ দেবে জাকাত আর অমুসলিমগণ চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর বা ট্যাক্স প্রদান করবে। এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। ইসলাম সর্বত্র শান্তি স্থাপন করতে চায়। তাই মুসলিম অমুসলিম নিয়ে একটি শান্তিময় জগত গড়ার প্রত্যয়ে ইসলাম বিভিন্ন জনের সাথে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ইসলামের উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

অমুসলিমদের সাথে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আচরন করেছেন শীর্ষক ডক্টর রাগিব সারজানীর বইটিতে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করে নবীজির(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত বিরাগভাজনের সাথেও ন্যায়পরায়নতা তুলে ধরেন,

"খায়বার যখন বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীয়াস্বরূপ একটি (ভুনা) বকরী প্রেরিত হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে আমার কাছে তাদের জমায়েত কর। তার কাছে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিষয়ে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল: হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তা হলে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম! যদি আমরা মিথ্যা বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, জাহান্নামী কারা? তারা বলল, আমরা সেখানে অল্প দিনের জন্যে থাকবো। তারপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাই সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে থাকো। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন, আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ বকরীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিসে তোমাদের এ উদ্বুদ্ধ করেছে? তারাবলল: আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোরূপ প্রতক্রিয়াশীল আচরণ না করে অত্যন্ত ধীরতার সাথে তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা ইয়াহূদীদের নিকট থেকে আগে ঘটনাটি যাচাই করলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রমান

সাব্যস্ত করলেন। এমনকি তারা নিজেরাই স্বীকার করল যে, হত্যা প্রচেষ্টায় তারা জড়িত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও খুজে বের করলেন যে এসব ইহুদীবা এক ইয়াহদী মহিলাকে আদেশকরেছিলেন?! সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মহিলাটিকে হত্যা করছেন না কেন?! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন। বললেন, 'এটা তো হত্যা প্রচেষ্টা মাত্র। বাস্তব হত্যা নয়। এর কারণে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না'। তিনি মহিলাকে কোনো শাস্তিও দিলেন না। মহিলাকে আদেশ দানকারী ইয়াহূদীদের কাউকেও না। কারণ, তিনি তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন। বিষ প্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তারা বলেছিল যে, আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা মুক্তি পেলাম। আর যদি সত্য নবী হন তাহলে বিষ আপনার কিছুই করতে পারবে না।রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। অথচ তাদের কেউই তখন মুসলিম ছিল না এবং পরবর্তীতেও ইসলাম গ্রহণ করে নি। এতে বুঝা যায় যে, তারা তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবুওয়াতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নয়; বরং হিংসা বশতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্যই তা করেছে।এতকিছুর পরও তাদের কাউকেই কোনো শাস্তি দেওয়া হয় নি...।

ডক্টর রাগিব সারজানি বইটিতে সদাচরন সম্পর্কে আরও বলেন,

আল্লাহ চাহে আমরা অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অধ্যায়টি নিম্নোক্ত তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের ঐশী পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনকারী অমুসলিমদের সাথে তাঁর সদাচরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ:

অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের ঐশী পদ্ধতি অমুসলিমদের সাথে সদাচরণে ঐশী পদ্ধতির সৌন্দর্যের মূল উৎস তো এটা যে, এ পদ্ধতি কোনো মানুষের বানানো নিয়ম-কানুন নয়, যা করা না করার ব্যাপারে মানুষ সমঝোতা করে নিবে; বরং তা হচ্ছে আসমানী ইলাহী পদ্ধতি। মুসলিমগণ ইবাদত হিসেবেই যার সার্বদায়িক বাস্তবায়ন করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا يَنۡهَىٰكُمُ اللهُ عَنِ الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (٨) [الممتحنة: ٨]

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করে নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" [সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮] কতোই না মহান আমাদের আল্লাহ..! কতোই না অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার...!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে অসিয়ত করেছেন যে, ঐ সকল মানুষদের সাথেও সদাচরণ করতে যারা আল্লাহ তা'আলার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরোধী পথ ও পন্থার অনুসরণ করেছে!! কতোই না অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার...!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে অসিয়ত করেছেন যে, ঐ সকল মানুষদের সাথেও সদাচরণ করতে যারা আল্লাহ তা'আলার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরোধী পথ ও পন্থার অনুসরণ করেছে!!

মুসলিমরা আকীদা-বিশ্বাসে তাদের বিরোধীদের সাথে সদাচরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে চায়। যতক্ষন না বিরোধীরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় অথবা তাদের প্রতি অত্যাচার করে..!!

أن تبروهم উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় ইবন কাসীর রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেন যে, ' تحسنوا إليهمতোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ কর'।

এ برবা সদাচরণ ন্যায়-ইনসাফ থেকেও উঁচু পর্যায়ের। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সদাচরণ-এর সাথে ন্যায় ও ইনসাফকে সংযোজন করেছেন।

أن تبروهم وتقسطوا إليهم

আবার আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সদাচরণের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণত সর্বোন্নত ও মহৎ আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটিকে সন্তান কর্তৃক মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কী? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "সময় মতো সালাত আদায় করা। অতঃপর পুনরায় প্রশ্ন করল যে, তারপর কোন আমল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ثم بر الوالدين»

"অতঃপর মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা" আবার কল্যাণ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ٩٢]

"তোমরা কখনও بِر বা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না কর।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২]

এভাবে কুরআন ও সুন্নাহে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যার প্রত্যেকটিতেই بِر বা সদাচরণের মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! যুদ্ধ চলাকালীন সময় ছাড়া অন্য সব সময় অমুসলিমদের সাথে এ بِر বা সদাচরণেরই আদেশ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে করেছেন। অমুসলিমদের সাথে আচরণের এ ঐশী পদ্ধতি যতটা মহৎ ও সর্বোন্নত ততটাই উন্নত ও মহৎ হবে এ পদ্ধতির চর্চা ও বাস্তবায়ন যে রাসূল করেছেন তাঁর চরিত্রও। যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

অমুসলিমদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যকার সম্পর্ক শুধু সাধারণ অর্থে শান্তি ও ঐক্যমতের সম্পর্কই ছিল না; বরং তা ছিল সকল অর্থেই বা সদাচরণের সম্পর্ক।

আমরা কখনও এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারবো না যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আশপাশের অমুসলিমদের সাথে এমন হৃদ্যতামূলক সদাচরণ করতেন যা কোনো মানুষ নিজ পরিবারের একান্ত আপন লোকদের সাথে করে থাকে। যেমন, আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ বিষয়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كان غلامٌ يَهُودِي يَخدم النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرض فأتاه النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِندَ رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيهِ وَهُوَ عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلم فخرج النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الحمد لله الذي أنقذه من النار»

"এক ইয়াহূদী ছেলে ছিল যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য আসলেন। অতঃপর তার মাথার কাছে বসে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর' তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাঁকালে তার পিতা বলল: তুমি আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা মেনে নাও। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন"।

আপনি একটু গভীরভারে মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে দেখুন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ইয়াহূদী ছেলেকে নিজের খেদমতের জন্য রেখেছেন, তাকে এ থেকে বারণ করেন নি। যাতে মদীনা মুনাওয়ারায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়। ছেলেটি অসুস্থ হওয়া পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য তার বাড়িতে যান। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে ছিলেন। তা সত্বেও তিনি অমুসলিম একটি ইয়াহূদী ছেলেকে নিজের খিদমত করতে বারণ করেন নি। আবার কোনো রাষ্ট্র প্রধান তার অসুস্থ চাকর/কর্মচারীকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা-শুশ্রুষা করার এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে?! বিশেষ করে সে চাকর/কর্মচারী যখন অন্য ধর্মাবলম্বী...?!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরণের অসংখ্য অগণিত ঘটনা আমরা পড়েছি। সুতরাং শুধু জানা ও জানানোর জন্যই নয়; বরং উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে এ ধরণের ঘটনা-ভাণ্ডারে চিন্তা-গবেষণা করে আমারা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারি।

আবার দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথাবীতে তাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য তথা দাওয়াতকেও ভুলে যান নি; তাই তিনি ছেলেটিকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং সে ইসলামকে গ্রহণও করেছে। ছেলেটির ইসলাম গ্রহণ তাঁকে (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতো আনন্দ দিয়েছে যে, যেন তাঁর পরিবারের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও নিকটতম কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এটিই হলো উন্নততর বা সদাচরণ।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قريش ، إذ عاهدوا رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فاستفتيتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت يا رسول
الله ! إن أمي أقدمت علي وهي راغبة أفأصلها ؟ أمي قال نعم صليها

"যখন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো তখন আমার মা'67 আমার কাছে আসল মুশরিক অবস্থায়। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছে এবং সে মুখাপেক্ষী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদাচরণ কর। "168

সে সময় কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে সাময়িকভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও তারা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর একটি যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়। এতদসত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার মশরিকা মাতার সাথে সদাচরণের আদেশ করেন তখন আমার মা আমার কাছে আসল মুশরিক অবস্থায়। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার কাছে এসেছে এবং সে মুখাপেক্ষী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার সাথে সদাচরণ কর। "168

সে সময় কুরাইশরা মুসলিমদের সাথে সাময়িকভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও তারা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর একটি যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়। এতদসত্বেও রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তার মুশরিকা মাতার সাথে সদাচরণের আদেশ করেন

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মসজিদে নববীর দরজার পাশে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি এটি খরিদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে কোনো প্রতিনিধিদল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার মঙ্গলের কোনো অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ধরণের কয়েক জোড়া পোশাক আসে, তখন তিনি তার এক জোড়া উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি রেশমের পোশাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করি নি। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখন এটি মক্কায় তাঁর এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দেন।

এখানে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজের রেশমী কাপড় জোড়া তাঁর এক মুশরিক ভাইকে 10 দিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন প্রতিবাদ করেন নি!

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থনও সুন্নাহ-এর অংশ (অনুসরণযোগ্য)।ইমাম নববী রহ. এ ঘটনার দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, কাফির নিকটতম আত্মীয়-এর সাথেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং কাফিরদেরকে হাদীয়া দেওয়া জায়েয; 171 বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে এমন আচরণ

করেছেন যা দেখে দুনিয়াবাসী অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে তাদের ধর্মীয় রীতিতে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইবন সায়্যিদুন নাস 172 তার 'উয়ূনুল আসর' গ্রন্থে বলেন, যখন তাদের (নাসারদের) সালাতের সময় হলো তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে শুরু করল, (সাহাবায়ে কেরাম কিছু বলতে চাইলে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও (কিছু বলো না)। অতঃপর তারা পূর্ব দিকে ফিরে সালাত আদায় করলো। 173

তারা শুধু মসজিদে নববীতে প্রবেশই করে নি; বরং সেখানে তাদের নিজ ধর্মীয় নিয়মে সালাতও আদায় করেছে। এক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কারো প্রতি সদাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন নি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনকারী অমুসলিমদের সাথে তাঁর সদাচরণ

পিছনের ঘটনাবলীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ ও অবাক হলেও তা ছিল আমাদের বোধগম্য এবং বিবেক মেনে নেওয়ার মতো বিষয়। কিন্তু যে বিষয়টি আকলেরও মেনে নিতে কষ্ট হয় তা হচ্ছে ঐসব লোকদের সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদাচরণ করা যারা তাঁকে নানাবিধ কষ্ট দিয়েছিলো এবং তাঁর ওপর যুলুম-অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে ছিল।

যে কোনো মহৎ চরিত্রের মানুষের নিকট নিজের ওপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের সাথেও ইনসাফ বজায় রেখে চলার আশা করা যায়। কিন্তু নিজের ওপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনকারীদের সাথে ইনসাফ নয় শুধু; বরং অনুগ্রহ, সহানুভুতি ও সদাচরণ দেখানো তো অসাধারণ আশচর্যজনক ব্যাপারই বটে..!!

বহুবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী পড়েছি যে, "তার সাথেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ যে তোমার সাথে তা বিচ্ছন্ন করে। তাকেও দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করে। ক্ষমা কর তাকেও যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে। "174

কিন্তু এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করা আমাদের মুসলিমদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। কেননা সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, বঞ্চিতকারীকে দান করা, অত্যাচারীকে ক্ষমা করা (তারা মুসলিম হলেও)

অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। আর যদিও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী, বঞ্চিতকারী ও অত্যাচারী ব্যক্তি অমুসলিম হয় তাহলে তো এমনটি চিন্তা করাও কঠিন..?!

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এধরণের ঘটনা অনেক বেশি। যার প্রত্যেকটিই উন্নত চরিত্র ও উত্তম আখলাকের অনুপম নিদর্শন হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আচরণ একক ব্যক্তির সাথেও করেছেন এবং দলবদ্ধ লোকদের সাথেও করেছেন। করেছেন বিভিন্ন গোত্র ও শহরবাশীদের সাথেও...। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাখল' নামক স্থানে খাসফার যুদ্ধে 175 ছিলেন। এমন সময় মুসলিমদের অসতর্কতায় হঠাৎ গাওরাস ইবনুল হারিস নামক এক ব্যক্তি তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট এসে দাঁড়াল এবং বলল: কে এখন আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ'। (এ উত্তর শোনার সাথে সাথে) তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারিটি উঠিয়ে বললেন, এখন কে তোমাকে আমার থেকে রক্ষা করবে? সে বলল: 'আপনি আমার প্রতি দয়াবান হোন।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই? সে বলল: না, কিন্তু আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি আপনার সাথে আর যুদ্ধে লিপ্ত হব না এবং

যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে তাদের অন্তর্ভুক্তও হব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন। বর্ণনাকারী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, অতঃপর সে তার সাথীদের নিকট 176 গিয়ে বলল, আমি এখন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি। "177

দেখুন, লোকটি তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট এসে তাঁকে হত্যার হুমকি দিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুক্তি দিলেন। সাথে সাথে অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে গেল। তরবারি চলে আসলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে প্রতিহিংসার কোনো চিন্তাই আসে নি; বরং তিনি তার নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করলেন। লোকটি ইসলামকে গ্রহণ করে নি। শুধু তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে যুদ্ধ না করার অঙ্গীকার করেছে মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সরলতার সাথে তার কথাকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়ে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একক ব্যক্তির সাথেই কেবল ক্ষমা, অনুগ্রহ ও সদাচরণ করেন নি; বরং অনেক গোত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর এ ধরণের ক্ষমা ছিল ব্যাপক। অনেক বড় বড় শহরবাসীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই ধরণের আচরণ করেছেন বহুবার। যে শহরের শত শত ও হাজার হাজার লোক তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করত এবং তাঁকে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট দিয়েই যেত।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে তিনি এমন দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা পেয়েছেন যা বর্ণনাতীত। তারা তাঁকে ও তার সাহাবীদেরকে প্রকাশ্যে, গোপনে, শারীরিক, মানসিক সর্বদিক থেকেই কষ্ট দিয়েছে। মক্কায় তো কষ্ট দিয়েছে। মদীনাতে যাওয়ার পরও ছাড়ে নি। এমনকি

সাহাবায়ে কেরাম যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন সেখানেও তারা তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল।

এভাবেই তাদের এ ইসলাম বিরোধী অভিযান দীর্ঘ কয়েক বছর চলতে থাকে। অবশেষে উহুদ যুদ্ধের দিন ঘটে গেল এক করুন ট্রাজেডি। সে দিন কুরাইশরা সত্তরজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে শহীদ করে। তারা আরবের রীতি- নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে শহীদদের লাশের বিশেষ করে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্মমভাবে বিকৃতি সাধন করে। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। তিনি দেখলেন সাহাবায়ে কেরামের শহীদী লাশগুলো উহুদের ময়দানে টুকরা টুকরা হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করার হীন চেষ্টা চালিয়েছে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। যার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিনের যোহরের সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারেন নি; বরং বসে বসে আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে, আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্যেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। এরই মাঝে কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহাড়ে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে।

এমন কষ্ট, পেরেশানী ও বিপর্যস্থ অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা মুবারক থেকে রক্ত মুছতে মুছতে তাদের জন্য বদ-দো'আ না করে বরং দো'আ করে বললেন,

«رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা আমাকে চিনতে পারে নি। "178

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ঠিক তেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছেন যেমনটি দয়াদ্র পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ পাওয়া সত্যেও করে থাকেন। তাইতো রাসূলুল্লা হ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত তুলে তাদের জন্য দো'আ করলেন; কিন্তু বদ-দো'আ করলেন না।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বার বার চ্যালেঞ্জ এবং মুসলিমদের সুবিন্যস্ত ঐক্যকে নির্মূল করার জন্য ধারাবাহিক যুদ্ধের পায়তারা করেই যাচ্ছিল। এরই প্রেক্ষিতে আরবের দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমরা করতে বাধা দিয়ে বসল। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হলো। কিছু দিন না যেতেই কুরাইশ কর্তৃকই পুনরায় চুক্তি ভঙ্গ হলো। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিক সময় বিভিন্ন যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করার পর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিজয় বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং মক্কার ঐ সকল লোকেরা একত্রিত হলো যারা এতোদিন তাদের মাঝে বসবাস করেছে ঠিকই কিন্তু তারা তাদের প্রাপ্য সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানটুকুও পায় নি। তাই তারা সকলেই এমন একটি রক্তপাতের দিনের প্রত্যাশা করেছে, যে দিন বিগত বছরগুলোর কষ্টের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অহংকারী কুরাইশবাসী লজ্জিত ও অপমানিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে দণ্ডায়মান হলো। অপেক্ষা করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদের ব্যাপারে হত্যার আদেশ করেন, নাকি দেশান্তর অথবা গোলামে পরিণত করার আদেশ করেন...। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও বিনয়ের সাথে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«!يا معشر قريش ما ترون أني فاعل منكم ؟

"হে কুরাইশবাসীরা, তোমরা কী মনে কর? আমি তোমাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেব?" তারা সকলেই বলে উঠল: 'কল্যাণের ফয়সালা করবেন। আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং দয়ালু পিতার সন্তান।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তোমরা সকলেই মুক্ত-স্বাধীন।"
এমনই...!
এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ..!!

★দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে মাসিক আলোর পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,
মুসলিম জাতি আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত। বর্তমানে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। যদি এসব সমস্যা নিয়ে আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে আমাদের সামনে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেয়ার কারণেই মুসলমানদের এই দুরাবস্থা। দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করাই হলো মুসলমানদের অবমাননাকর জীবনের মূল কারণ।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের আদেশ দাও এবং অসৎকর্মের নিষেধ করো। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।’ (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০) আয়াতটির দিকে ভালোভাবে মনোযোগ দিন। এখানে আল্লাহ তাআলা একথা বলেননি যে, তোমাদের কেবল মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই পাঠানো হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, তোমাদের পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। সুতরাং বোঝা গেলো, মুসলিম জাতির সৃষ্টি বিশ্বমানবতা তথা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য; শুধু মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়।
উক্ত আয়াতে বিশ্বমানবতার কল্যাণ কীভাবে হবে তাও পরিস্কার করে বলে দেওয়া

হয়েছে। বলা হয়েছে- ‘তোমরা সৎকর্মের আদেশ দাও এবং অসৎকর্মের নিষেধ করো।’ আর যেহেতু সৎকর্মের মূল হলো ঈমান আর অসৎকর্মের উৎস হলো কুফর ও শিরক, তাই কুফর ও শিরক থেকে মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ঈমানের দাওয়াতকে ব্যাপকতর করাই হবে সবচেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ।

মানুষের জীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের নমুনা মাফিক তখনই হবে যখন তার খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, বেশভূষা, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি সবই হবে রাসূলের মতো। এমনিভাবে যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন, যে কাজের জন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও ব্যথা-বেদনা সবচেয়ে বেশি ছিলো, যে কাজের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করেছেন; যদি উম্মতও ব্যথাভরা মন নিয়ে, বুকভরা দরদ নিয়ে সেই কাজে বেশি সময় ব্যয় করে এবং কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করে তবেই বলা হবে যে, উম্মত রাসূলের আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণ করছে। যদি উম্মত শুধু ইবাদত-বন্দেগীতেই লিপ্ত থাকে, দাওয়াতের কাজে অংশ না নেয়, তাহলে এই উম্মতকে কিছুতেই নবীজীর পুরোপুরী অনুসারী বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য কী পরিমাণ পেরেশান ছিলেন, কী পরিমাণ ব্যথিত থাকতেন তা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- ‘তারা ঈমান আনছে না বিধায় আপনি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।’ (সূরা শুআরা, আয়াত : ৩)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘দাওয়াতের রাস্তায় আমার মতো এত জুলুম অন্য কোনো নবী-রাসূলকে করা হয়নি।’এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযি.কে সম্বোধন করে বলেছেন- ‘হে আলী! তোমার দ্বারা যদি একজন লোকেরও হেদায়েত মিলে যায়, তাহলে তোমার নাজাতের জন্য তা-ই যথেষ্ট।’ (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল

এই গবেষণার কাজে ২০ জনের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এর মধ্যে ১০ জন দ্বীনদার, ৬ জন মডারেট মুসলিম, ৩ জন নওমুসলিম এবং ১ জন অমুসলিম।

তাদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করা হয়েছিলো,

১.অমুসলিমদের সাথে সদাচরন কি তাদের দাওয়াতের অংশ?

২.এর তাৎপর্য কতটুকু?

৩.তুমি ব্যক্তি জীবনে অমুসলিমদের সাথে কেমন আচরন করো।দাওয়াতের স্বার্থে

★ দ্বীন মেনে চলেন যারা তাদের উত্তর ছিলো আশানুরুপ।

তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, ১. হ্যাঁ। আমাদের সকলেরই উচিৎ সকল অমুসলিমদের সাথে আদব এর সাথে দ্বীনের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২.রাসূল(স.) এর সব চেয়ে বড় সুন্নাহ ছিলো দাওয়া। তিনি অমুসলিমদ ভাই ও বোনদের মাঝে দাওয়াত দিতেন। তাই নিজে ইলম শিখবো অন্যকে শেখাবো এবং সবার সাথে সুন্দর আচরণ করবো।

৩. আমি এই পর্যন্ত যতটুকু জেনেছি ততটুকু দিয়ে আমি অমুসলিমদের প্রতি সুন্দর আচরণ করার চেষ্টা করি কারণ ওরাও আমাদের দ্বীনি ভাই এবং দ্বীনি বোন। দাওয়াতের সার্থে এখনো ওইভাবে কাউকে বলা হয়ে উঠেনি। কারণ আমি আগে এত বুঝতাম না যে আমার অমুসলিমদ ভাই এবং বোনদের সাথে কিরুপ আচরণ করা উচিৎ। এখন আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু জেনেছি আল্লাহ পাক যতটুকু জানার বুঝার তাওফিক দিয়েছি আশা করছি এখন থেকে এতটুকু কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

আরেকজন বলেছেন, ১.হ্যা মনে হয়

২.জানিনা

৩.দাওয়াতের বিষয়ে কোনো কথা হয়না। হইলেও উনারা শুনে না।

৩য় জন বলেছেন,অবশ্যই অমুসলিমরা আমাদের সদাচার পাবার হকদার,তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য কাজ।
মোটকথা উনারা দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা জানেনা বিধায় উত্তরগুলো আশানুরুপই মনে হয়েছে।উনারাও ব্যক্তি জীবনে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করেন।

এবং বাকিদের উত্তর ছিলো তারা এ বিষয়ে কখনো ভেবে দেখে নি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করেছে যে অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়া আমাদের দ্বীনি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
★মডারেট মুসলিমদের থেকে পাওয়া উত্তরের উপর ভিত্তি করে বলা যায় তারা বন্ধুত্ব সুলভ আচরন করলেও ইসলামের দাওয়াত খুব একটা দেয়না।ভালো ব্যবহার করে।
★নওমুসলিমরা খুবই হতাশ মুসলিমদের দাওয়াতের বিষয়ে অনিহা দেখে।তারা চায় মুসলিমরা খুব গুরুত্বের সাথে অমুসলিমদের ইসলামের পথে ডাকুক।তারাও ইসলামের ছায়াতলে আসতে পেরে ধন্য।নিজেরা দাওয়াত দেন তাদের পরিচিতদের।
★অমুসলিম মেয়েটি বলেছিলো এভাবে ধর্ম না ছড়িয়ে বাস্তব জীবনে ভালো কাজ ছড়াও। আমাকে ধর্ম নিয়ে এইসব বলো না।আমি বিরক্ত হই।
মুসলিম অমুসলিম এইসব আমি লালন করি না।মানুষ মানুষ ই।

উপসংহার

মানব থেকে মানবতা, প্রতিটি মানুষের মানবতার দাবি হলো, সে অন্য মানুষের উপকার করবে। আর কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আমরা মুসলমানগণ জানি, প্রতিটি অমুসলিম মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُولـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম।

প্রিয় পাঠক! আপনার প্রতিবেশী হিন্দু বা খ্রিস্টানদের বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে আপনি কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবেন? অবশ্যই আগুন নিভাতে যাবেন। আল্লাাহ না করুন, যদি কোনো মুসলিম মহল্লায় আগুন লেগে যায়, তাহলে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবে না? অবশ্যই আগুন নিভাতে আসবে। দেখুন! আমরা দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য কত সুন্দর মানবতার পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু একটু কি চিন্তা করেছি যে, দুনিয়ার আগুনে জ্বলে যদি কারো ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, বা ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাহলে ঔষধ দ্বারা পুনরায় ত্বক ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি বানানো সম্ভব। কিন্তু যে ভাইটি ইসলাম গ্রহণ না করে, চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, যার থেকে ফেরানো বা বাঁচানোর কোনো পথ নেই, সেই চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য কি কখনো ভেবেছি?

আমাদের অনেক অমুসলিম বন্ধু আছেন, যাদের সাথে একত্রে চলা-ফেরা করি। একই অফিসে চাকরি করি। তার দোকান থেকে কেনা-কাটা করি। তার বিপদে-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াই। একথাও জানি এই ভাইটি মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী আগুনে জ্বলবে

আমাদের কেমন মানবতা? আমার সামনে আমার এক ভাই বা বোন জাহান্নামের চির স্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো দিন এই ভাইটিকে বলিনি যে, ভাই! তুমি যে পথে চলছো এটা জাহান্নামের পথ। কোনো দিন তাকে জান্নাতের পথ ইসলাম দেখাই নি। কেমন জানি তাকে আগুনে জ্বলতে দেখেও আমি চুপ হয়ে আছি। এটা আমাদের কেমন মানবতা? আর কতো দিন এভাবে দেখব? বলুন! এভাবে আর কতোদিন বসে বসে তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখব? চলুন, আর সময় নেই, আমার কাছে যদি সত্যিকার মানবতা থাকে, তাহলে আমার প্রতিবেশী অমুসলিমকে আগুনে জ্বলতে দেব না। আমাদের দায়িত্ব হলো তাকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেয়া। মানা না মানা তার ব্যা পার। দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার, গ্রহণ করা-না করা তাদের এখতিয়ার। আল্লা হ তাআলা আমাদেরকে তাদের আমানত 'ইসলাম' তাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ওদের কে চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচানোর মাধ্যম বানিয়ে নিন এবং আমাদের ওপর তিনি খুশি হয়ে যান। আমীন।

অমুসলিমরা আমাদের ভাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সকলকে এক মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন ।সৃষ্টিগত ভাবে আমরা মুসলিম হিসেবে জন্মেছি আল্লাহ আমাদের দয়া করেছেন।কিন্তু আমার অন্য ভাইয়েরা যারা অমুসলিম তারা আমাদের দাওয়াতের হকদার।তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। আমরা কোরআন হাদীস অধ্যায়ন করে বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটাবো।আমরা চাইবো কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে আমাদের প্রিব হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সংখ্যা অনেক বেশি হোক।অমুসলিমরাও মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরন করুক, তারাও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাক।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে কোরআন, হাদীস, সুন্নাহের আলোকে অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরন করার এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার তৌফিক দান করেন।আমিন